Subject : Bengali
M.Phil 2nd Semester
Paper : I (Sahityer Itihas)
Paper No. : BNG 211
Unit : IV (Bangla Katha Sahityer Itihas)
Topic : Abu Ishaker Uponyas

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও আবু ইসহাকের উপন্যাস

মহর্ষি সরকার

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজকে কেন্দ্র করে লেখা উপন্যাসের সংখ্যা নেহাত কম নয়। বস্তুত, চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে পূর্ববঙ্গের জনজীবনের সংস্কৃতি ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ নির্ভর। তাই সেই সময়ের সাহিত্যে গ্রামকেন্দ্রিক আখ্যানই প্রাধান্য পেয়েছে। এর প্রমাণ তৎকালীন ঔপন্যাসিক আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩), আবু জাফর শামসুদ্দিন (১৯১১-৮৮), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৮), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-৭১), আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) প্রমুখের উপন্যাসে পাওয়া যায়।[১] এমনকি আবু ইসহাক নিজেও তাঁর *স্মৃতিবিচিত্রা* গ্রন্থে স্বীকার করেছেন, 'আমি গ্রামের ছেলে এবং গ্রামের মানুষদের নিয়েই আবার যত লেখালেখি।[২] এদেশের মাটি, মানুষ ও প্রকৃতি ছিল তাঁর লেখক মানসে। তাই মানবজীবন ও শিল্পের নিপুণ সমন্বয়ে সমৃদ্ধ তাঁর সাহিত্যকর্ম।

আবু ইসহাকের সাহিত্যকর্মের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল *সূর্য দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫) ও *পদ্মার পলিদ্বীপ* (১৯৮৬) নামে দুটি উপন্যাস, যার বিষয়বস্তু গ্রামের মানুষ, গ্রামীণ সমাজ ও জীবন।

মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের মন্বন্তর-দাঙ্গা-স্বাধিন ভূখণ্ডপ্রাপ্তি ও মানুষের বিপর্যস্ত ভাগ্যজনিত মোহভঙ্গের প্রেক্ষাপটে লেখা আবু ইসহাকের প্রথম উপন্যাস *সূর্য দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫)।[৩] ১৯৪৩ -এর মন্বন্তর পটভূমিকে আশ্রয় করলেও অনক্ষর কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক গ্রামীণ সমাজ পরিবেশের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিজীবনের সুতীব্র সংগ্রাম ও অসহায়তা এর প্রধান উপজীব্য। এই উপন্যাসে আমরা দেখি গ্রামবাংলার সেইসব অসহায় মানুষদের যারা 'এক বাটি ফেনের জন্য'[৪], একবাটি খিচুড়ীর জন্য'[৫] দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিল, তাদের অনেক আশা ছিল স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রে নিম্নবর্গ মানুষের কণ্ঠে বেজে ওঠে আশাভঙ্গের বেদনা—

> কত আশা-ভস্‌সা আছিল। স্বাদীন অইলে ভাত কাপড় সাইয্য অইব। খাজনা মকুব অইব। কিন্তু কই? বেবাক ফাঁট্‌কি। আবার লেল গাড়ির ভাড়াও বাইড়্যা গেল।"[৬]

উপন্যাসটিতে গ্রামীণ সমাজের তিনটি শ্রেণির বিশদ চিত্র পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণিতে রয়েছেন গদু প্রধান, খুরশীদ মোল্লা, কাজী খলিল বক্‌শ প্রমুখ জমিদার-মহাজন-কালবাজারীরা যারা গ্রামে গণ্যমান্য বলে পরিচিত। দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছেন করিমবক্‌শের মতো মানুষ। জমির আয়ে সংসার চলে না বলে অন্যের জমিতে শ্রম খাটায়। আর তৃতীয় শ্রেণিতে রয়েছে জয়গুণ, শফীর মা, জোবেদালী ফকির প্রমুখ নিম্নবিত্ত মানুষ- এঁরা প্রত্যকেই ভূমিহীন। এঁদের মধ্যে শফীর মা ভিক্ষুক, জোবেদালী ভণ্ড ফকির। উপন্যাসে কৃষিভিত্তিক গ্রামবাংলার বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক-বৈচিত্র্যের বিশদ চিত্র আছে। তবে সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যে নিম্নবর্গের মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামই এতে প্রধান। আর এই নিম্নবর্গ মানুষের প্রতিনিধি

জয়গুণের জীবনের প্রতিকূলতার সিংহভাগ সমাজ-সৃষ্ট। দুর্ভিক্ষের জ্বালা থেকে বাঁচতে প্রথমে তালাকপ্রাপ্তা এবং পরে বিধবা জয়গুণ শহরে যায়। কিন্তু কাজ না পেয়ে ফিরে আসে গ্রামে। জয়গুণের মতো দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষিজীবী মানুষের অবস্থা-

তাদের শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। পেট গিয়ে মিশেছে পিঠের সাথে। ধনুকের মত বাঁকা দেহ-শুষ্ক ও বিবর্ণ।[৭]

জয়গুণ এমনিতেই দরিদ্র-ভুমিহীন, আর নারী হওয়ায় তার কষ্ট আরও বেশি। যে সমাজে জয়গুণের বাস, সেখানে গৃহনারীর জীবিকার্জনে 'পর্দা' ছেড়ে বাইরে বেরোনো নিষিদ্ধ ছিল। এই নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত সমাজপতি গদু প্রধান ও মসজিদের ইমামের কণ্ঠে। 'পান্তাভাতে পোড়ামরিচ', 'ফেন' ভাগাভাগি করে খাওয়া জয়গুণ এবং তার পরিবারকে সমাজ বাঁচার পথ করে না দিলেও তাদের 'পর্দা' ছেড়ে বেরোনোর কালে ঠিকই ভ্রুকুটি চালায়। ঘরে একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও জমিদার গদু প্রধান 'দুই কানি জমিন আর একখান ঘরের' প্রলোভন দেখিয়ে জয়গুণের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। কারণ সে ভাবে, দরিদ্র জয়গুণের বেঁচে থাকার জন্য এই প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। জয়গুণ ছাড়াও এই উপন্যাসের কৃষিজীবীরা দিনরাত্রি কেবল বেঁচে থাকার চিন্তায় মগ্ন। দিনমজুর লেদুর সংলাপে আবু ইসহাক চিত্রিত গ্রামীণ সমাজের অমানবিক চরিত্র ফুটে উঠেছে, যেখানে জমিদার-মহাজন ও সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে বিস্তর ফারাক-

তোমার গোলাভরা ধান আছে। তুমি এক সেরের বদলে দুই সের খাইলেও তোমার গোলা ঠিক থাক্‌ব। কিন্তু সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া রুজি করি পাঁচসিকা। এই ট্যাকা পেডে দিমু, কাপড়ে পিন্দুম, না এর তন রাজার খাজনা দিমু? ঘরে পরিবার আছে। ... সারাদিন খাইট্যা সোয়াসের চাউল গামছায় বাইন্দা ঘরে ফিরি।[৮]

অমানবিক সমাজ প্রয়োজনে যে কতটা নির্মম-হিংস্র হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ আমরা পাই জয়গুণের কন্যা মায়মুনের বিয়ের সময় সমাজ যখন তাকে 'বেপর্দা আওরত' বলে প্রত্যাখ্যান করে। গুটিকতক ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত রক্ষণশীল সমাজ জয়গুণের ওপর চাপিয়ে দেয় 'তোবা' বা প্রায়শ্চিত্ত। তার অপরাধ, জীবিকার প্রয়োজনে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিল। গ্রাম সমাজের কর্ণাধার জমির মালিক গদু প্রধান রাতের অন্ধকারে হত্যা করে জয়গুণের প্রাক্তন স্বামী করিমবক্‌শকে। বাঁচার আশা নিয়ে জয়গুণ শহর থেকে গ্রামে ফিরে এসেছিল, তা আসলে মানুষের বাঁচার সম্ভাবনাকে সংকুচিত করে দেয়। ফলে জয়গুণ পুনরায় সন্তান সঙ্গে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে যাত্রা করে অজানার উদ্দেশ্য। সমালোচকের ভাষায়-

জয়গুণের গন্তব্য ঔপন্যাসিক দেখাননি। কিন্তু এটাই সত্য অসুস্থ ক্লিষ্ট সমাজে জয়গুণের সুস্থ বসবাস সম্ভব নয়। ভূসম্পত্তিধারী-মহাজন-কালবাজারি নিয়ন্ত্রিত বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের গ্রাম নিম্নজীবি মানুষের কাছে প্রসন্ন আশ্রয়ের পরিবর্তে বৈরী ভূখণ্ড হয়ে দাঁড়ায়।[৯]

'সূর্য দীঘল বাড়ী'র সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক। আর সেই কারণে সমাজে মেয়েদের থেকে ছেলেদেরকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। এমনকি প্রবাদেই বলা হয়েছিল=

পুত্র সে হাতের লাঠি বংশের চেরাগ।
কন্যা সে মাথার বোঝা কুলে দেয় দাগ। [১০]

সমাজের এই বিশেষ সংস্কার ও নীতি নির্দেশ মেনে জয়গুণের তিন বছরের ছেলে কাসু রয়ে গেলো করিমবক্‌শের কাছে, আর মায়মুন ও কোলের মেয়েটির জায়গা হলো পরিত্যক্তা মায়ের কোল।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা প্রায় ছিল না বললেই চলে। তাছাড়া তাদের সবসময় পর্দার আড়ালে রাখার চেষ্টা করা হতো। তাই দেখা যায়, জয়গুণ তার ঘরের প্রথম দিনের চারটি ডিম তার ছেলে হাসুর হাত দিয়ে মসজিদের মোল্লার কাছে পাঠিয়ে দিলে তিনি সেগুলিকে **'বেপর্দা আওরতের চীজ'** বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ জয়গুণ ট্রেনে করে চাল নিয়ে এসে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করে এবং সকলেই তার মুখ দেখতে পাই। পুথিতেও বলা ছিল-

মুখের ছুরত যার পুরুষে দেখিবে
বিছা, বিচ্ছু, জোঁক তারে বেড়িয়া ধরিবে।
যে চুল দেখিবে তার পুরুষ অচিন,
সাপ হইয়া দংশিবে হাশরের দিন।
যে নারী দেখিবে পর পুরুষের মুখ
শকুনি গিরিধিনী খাবে ঠোকরাইয়া চোখ। [১১]

পুথির এই ছড়া থেকেই আমরা সেই সময় সমাজে মোল্লা তন্ত্রের প্রভাব ও তাঁদের তৈরি নানাবিধ সংস্কারের ছবি খুঁজে পাই।

আবু ইসহাকের দ্বিতীয় উপন্যাস *পদ্মার পলিদ্বীপ* (১৯৮৬)-ও বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা।এই উপন্যাসটি আবু ইসহাকের সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের পরিশ্রম, অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার ফসল। আর তার ছাপ রয়েছে এই উপন্যাসের পাতায় পাতায়।

বস্তুত, নিম্নবঙ্গীয় পদ্মাপারের জনজীবনে শ্রেণি, মর্যাদা, ক্ষমতার ভিত্তিতে যে সামাজিক স্তরবিন্যাস দেখা যায় আবু ইসহাক তা লক্ষ করেছিলেন। তাই উপন্যাসের কাহিনিতে যে গ্রামীণ সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তাতে বেশ কয়েকটি সামাজিক শ্রেণি পরিচয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এই শ্রেণিগুলি ক্রমনিম্নস্তরে সাজালে দাঁড়ায়- জমিদার-নায়েব- বন্ধকদার-গ্রাম্য মাতব্বর-পুলকি মাতব্বর- বর্গাদার কোলশরিক। এই সামাজিক স্তর বিন্যাস দেখে বোঝা যায় যে, জাতিবর্ণ প্রথা, কৃষিভিত্তিক পেশা, কৃষি-বহির্ভূত পেশা, বংশমর্যাদা ইত্যাদির সঙ্গে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শ্রেণিবিন্যাসের সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া সেইসময় মৎস্যজীবীদের খুবই নীচুস্তরের মনে করা হতো। উপন্যাসে দেখা গেছে,এরফান মাতব্বরের টানাটানির সংসারে লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে তার পুত্র ফজল মাছ বিক্রি করে টাকা পয়সার জোগান দিতে শুরু করলে গ্রামীণ সমাজ তাতে সমর্থন জানায়নি, এমনকি শ্বশুরও তাঁকে অপদস্থ করেছে, ফজলের স্ত্রিকে এরফান মাতব্বরের বাড়িতে না পাঠিয়ে কৌশলে তাঁকে তালাক দিতে বাধ্য করেছে এবং চাপের মুখে স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও লক্ষ করি। ফজল তাঁর দলীয় বর্গাদার কোলশরিকদের আর্থিক কষ্ট ঘোচাতে মাছ ধরার প্রলভন্দেখালে তাঁরা প্রথমদিকে মাছ ধরতে অস্বীকার করেছে।

আর্থিক প্রতিপত্তি, মাটির জোর ও লাঠির ক্ষমতার প্রভাবের সঙ্গে শ্রেণি বিভক্ত গ্রামিঙ্গসমাজে আরেকটি উপদান সামাজিক স্তরবিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেটি হল বংশমর্যাদা। আর তাই জঙ্গুরুল্লা প্রচুর অর্থ ও ভূমির মালিক বনে যাওয়া সত্ত্বেও মৌলনা সাহেব প্রদত্ত তাঁর 'চৌধুরী' খেতাবকে চরের মানুষেরা স্বীকৃতি দেয়নি। কারণ তাঁর বংশমর্যাদা ছিল না। তাই জঙ্গুরুল্লার ছেলের সঙ্গে কাজী বাড়ির মেয়ের সম্বন্ধ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়-

> কিছুদিন আগে তার সেজো ছেলে জহীরের বিয়ের সম্বন্ধের জন্য সে ঘটক পাঠিয়েছিল উত্তরপাড়ের ভাতপাড়া গ্রামের কাজীবাড়ি। শামসের কাজী প্রস্তাব শুনে 'ধ্যুত ধ্যুত' করে হাঁকিয়ে দেন ঘটককে। বলেন, 'চদরী নাম ফুডাইলে কি অইব! সাতপুরুষেও বংশের পায়ের ময়লা যাইব না।'[১২]

আলোচ্য উপন্যাসে গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামোর যে সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে দেখি কুচক্রীতে সিদ্ধহস্ত 'পা-না-ধোয়া' জঙ্গুরুল্লা ক্ষমতা ও আর্থিক প্রভাব খাটিয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে তার পক্ষে ব্যবহার করে। ষড়যন্ত্র, কূটকৌশল অবলম্বন করে জঙ্গুরুল্লা এরফান মাতব্বরের জমি দখল করে নেয়; ফজলকে মিথ্যা ডাকাতি মামলায় ধরিয়ে দেয়; ঘৃণ্য স্বার্থ চরিতার্থ করতে ফজলকে অন্যায়ভাবে মিথ্যা ছলনার আশ্রয় নিয়ে তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য করে। এখানে স্থানীয় পুলিশকে জঙ্গুরুল্লা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে। জেল থেকে বেরিয়ে ফজল জঙ্গুরুল্লার দখলি চর পুনর্দখল করে নীলে তাঁর ও তাঁর বর্গাদারদের বিরুদ্ধে ঘর পোড়ানোর মামলা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এমনকি হেকমত মাছ ধরতে গিয়ে গর্তের ভেতর হাত ঢুকিয়ে জলে ডুবে মারা গেলে সেখানেও হেকমতের মা ও জরিনাকে ফজলের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়ার চেষ্টা করতে দেখি। এইভাবেই এই উপন্যাসে চরের গ্রামীণ সমাজে ভূমিমালিকদের চরদখলের জন্য দ্বন্দ্ব, কলহ ও বিরোধের স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে।

প্রাক-ব্রিটিশ পূর্ববাংলার মুসলিম গ্রামীণ সমাজ সাধারণত দুটি শ্রেণিতে বিভাজিত হতে দেখা যায়; প্রথমত, ভিনদেশি স্বভাবজাত উচ্চতর স্রেনিএবন অপরটি স্থানীয় জনতার সমন্বয়ে গঠিত নিম্নবর্গীয় শ্রেণি। 'পদ্মার পলিদ্বীপে' যে সমাজচিত্র আঁকা হয়েছে সেখানে উচ্চতর শ্রেণির কোনো অস্তিত্ব নেই বললে এমনটি বলা যায় না। সাধারণ জনতার মধ্যে নামমাত্র দুকয়েকজন জেমন-জঙ্গুরুল্লা, এরফান মাতব্বর, আরশেদ আলী প্রমুখের ভূমি মালিক হয়ে উঠবার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। সেইসময় সমাজে বর্ণহিন্দু সমাজের লোকেরাই সাধারণত অভিজাত জমিদার, ভূমি মালিক, ব্যবসায়ী, প্রশাসক গোষ্ঠী ছিল। পদ্মার চরাঞ্চলে আশরাফ বা উচ্চ শ্রেণির মুসলমান তেমনটা পাওয়া যায় না।

তবে সমাজবিজ্ঞানীদের মূল্যায়নে ধরা পড়ে গ্রামীণ মধ্যসত্ত্বভোগীদের ক্ষমতার দাপট। কারণ সেকালে বিভিন্ন কূটকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে মধ্যসত্ত্বভোগীরা হয়ে উঠেছিল জমিদারদের চেয়েও ক্ষমতাবান। এই উপন্যাসে জঙ্গুরুল্লা যেন ব্রিটিশশাসিত বাংলার চরাঞ্চলের বা সমতলভূমির সেরকম এক নির্মম শ্রেণি প্রতিনিধি।

গ্রামীণ সমাজে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তিদের সম্মান করা হতো। সমাজে প্রবীণ বা বয়সে বড় এমন মানুষকে নবীনরা যদি অসম্মান করতো, নাম ধরে ডাকত, 'তুমি' 'তুমি' করে সম্বোধন করত, তাহলে অসম্মানকারীকে সমাজ ভালো চোখে দেখত না। উপন্যাসে ফজলের প্রতিক্রিয়া নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে স্পষ্টত ধরা পড়ে-

> ফজলের রাগ ধরে যায়। রাগটাকে কোন রকমেবাগ মানিয়ে সে ধীরভাবে বলে, 'নায়েব মশাই আপনার বয়স ষাট পার হয়ে গেছে?' [১৩]

পদ্মার পলিদ্বীপে-র সমাজ ছিল পিতৃপ্রধান। শুধু পদ্মা তীরবর্তী নিম্নবঙ্গীয় এলাকাতেই নয়, সমগ্র বানলাদেশেই গারো ও খাসিয়া মাতৃপ্রধান জনগোষ্ঠী ছাড়া অন্য সমস্ত সমাজই পিতৃপ্রধান।

এই উপন্যাসে যে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা দেখাজায় সেখানে যৌথভাবে কাজকর্ম করার সন্ধান পাওয়া জায়।এগুলো হয়ে থাকে চরদখল, চর পাহারা, চোরে ফসল উৎপাদন, অর্থ উপার্জন, ঘরবাড়ি নির্মাণ, জমির ক্ষেত্র তৈরি, মাছ ধরা ইত্যাদিকে ঘিরেই। একা একা চরদখল, চর পাহারা দেওয়া বা চর দখল প্রতিরোধ সম্ভব নয়।আরেসব কাজে প্রচুর লোকের প্রয়োজন হয়। তাইদেখাজায়, জোতদার মাতব্বরের পরেসমস্ত লোকেই বলাচলে চর দখল কিংবা প্রতিরোধে অংশ নেয়।

এইভাবে আবু ইসহাক তাঁর এই দুটি উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার ক্ষমতা কাঠামোর চিত্রটিকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পাশাপাশি এই চিত্রটি সমগ্র বাংলার গ্রামীণ সমাজের চিত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলার গ্রাম আজ হয়তো সময়ের সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের অনেক গ্লানিকে ত্যাগ করতে পেরেছে। তবুও অশিক্ষা, খাদ্যের অভাব, কাজের অভাব, কুসংস্কার মগ্নতা আজও বর্তমান। বর্তমান থাকেই চিরকাল কিছু না কিছু। আর সে কারণেই আবু ইসহাকের মত ব্যক্তিত্বরা 'সূর্য দীঘল বাড়ী' ও 'পদ্মার পলিদ্বীপ' রচনায় সম্ভাব্যতার কথা বলেন। যে সম্ভাব্যতাকে আলোচনা দিয়ে নয় প্রকৃত পাঠেই অনুভব সম্ভব। আবু ইসহাকের উপন্যাস পাঠের এই আবেদন দিয়েই তাই শেষ টানা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. ভুঁইয়া ইকবাল, *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৪১, পৃষ্ঠা. ৪।

২. আবু ইসহাক, 'অম্লান স্মৃতি', *স্মৃতি বিচিত্রা,* সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা. ১১১।

৩. ড. স্বপ্না রায়, *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচেতনা,* অনুপম প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা. ২৭।

৪. আবু ইসহাক, *সূর্য দীঘল বাড়ী,* চিরায়ত প্রকাশন, কলিকাতা, জুন ২০০১, পৃষ্ঠা. ৩৯।

৫. ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৯।

৬. ঐ, পৃষ্ঠা. ৮৬।

৭. ঐ, পৃষ্ঠা. ৯।

৮. ঐ, পৃষ্ঠা. ৮৯।

৯. মহীবুল আজিজ, *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ,* ফেব্রুয়ারি ২০০২, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা. ১৭৫।

১০. আবু ইসহাক, *সূর্য দীঘল বাড়ী,* জুন ২০০১, চিরায়ত প্রকাশন, কলিকাতা, পৃষ্ঠা. ২৩।

১১. আবু ইসহাক, *সূর্য দীঘল বাড়ী,* জুন ২০০১, চিরায়ত প্রকাশন, কলিকাতা, পৃষ্ঠা. ২২।

১২. আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ,* এপ্রিল ১৯৮৬, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃষ্ঠা. ৪৫।

১৩. ঐ, পৃষ্ঠা. ৫৫।